সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,খুলনা কর্তৃক আয়োজিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক

<u>মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে ভার্চুয়াল সেমিনার</u>

তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি-২০২১

শিরোনাম: 'বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে একুশ'

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম,অধ্যক্ষ

বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম,উপাধ্যক্ষ

প্রবন্ধ উপস্থাপক: মোহাম্মাদ মহিববুল্লাহ, প্রভাষক

আলোচকবৃন্দ: মোঃ আশরাফুল আলম, সহকারী অধ্যাপক,রাষ্ট্রবিজ্ঞান

মোঃ সাইফুর রহমান,সহযোগী অধ্যাপক,দর্শন

সঞ্চালক: বিধান চন্দ্র রায়, প্রভাষক,শিক্ষা ও যুগ্ম সম্পাদক,শিক্ষক পরিষদ

সভাপতি: রহিমা খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক, গণিত ও সম্পাদক,শিক্ষক পরিষদ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঙালি চেতনার মূলমন্ত্র। একটি মহৎ দিন জাতির জীবনে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য দুনিয়াজোড়া মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী যে সংগ্রাম,একুশে ফেব্রুয়ারি তাকে এক নতুন চেতনায় উন্নীত করেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ভাষা আন্দোলন একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির সাংস্কৃতিক ঘটনা। বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এই আন্দোলন করা হয়েছিল, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমিত ছিল এই আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন ছিল মুখ্যত একটি জাতীয় সংগ্রাম। পাকিস্তানি রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে শোষণ ও দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ করার মাধ্যম হিসেবেই ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়। সামাজিক,রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল এই প্রতিবাদ। জাতীয়তাবাদের স্রোতধারা দীর্ঘদিন ধরেই বইছিল এই ভূখণ্ডে। অখণ্ড বাংলার আকাঙ্ক্ষাও এক সময় ছিল প্রবল। কিন্তু বাঙালি জাতি তার জাতিসত্তাকে কখনও এমন করে সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহে আন্দোলনের সূচনা হলেও পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় উনিশ শত বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন।

<u>বাঙালি জাতিসত্তার স্বরুপ সন্ধানে একুশ</u>

আজ বাঙালি বলতে যে জনগোষ্ঠীকে বুঝি তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এদেশ একক নামের অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোনো পরিচয় মেলে না। হাজার বছরের পুরনো ‘চর্যাগীতিতে’ বাঙালির কথার পরিচয় আছে। বাঙালির দুর্ভাগ্য বাঙালি ঐতিহাসিক যুগে বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি দ্বারা শাসিত। ফলে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বিবর্ণ খবর ইতিহাস বহন করলেও তাতে বাঙালি তার স্বরুপে অনুপস্থিত। কাজেই বাঙালির ইতিহাস আজো বলতে গেলে অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত। বাংলাভাষী অঞ্চল বৃটিশ পূর্বকালে কখনো একচ্ছত্র ভাষিক ঐক্যও হয়েছিল ব্যাহত। বহুকাল এদক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মানুষ অভিন্ন জাতিসত্তায় সংহত হতে পারেনি বরং বিভিন্ন বিদেশির আঞ্চলিক শাসনে ক্লিষ্ট,আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ আত্মমর্যাদালাভের বিকৃত বাসনায় মিথ্যা পরিচয়ে আত্মতুষ্টির যে পথ অবলম্বন করেছিল তা পরিণামে আত্মহননের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা,এতে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এদেশের বৌদ্ধমাত্র মগধী,হিন্দুমাত্রই আর্যবর্ত,মুসলিমমাত্রই আরব-ইরানীয় কিংবা মধ্য এশিয়। হিন্দুদের মন পড়ে থাকে গয়া-কাশিতে,মুসলিমদের মক্কা-মদীনায়। দেশীয় জাতীয়তায় বাঙালি দিক্ষিত হয়নি। তাই বলা যায়-জনে জনে জনতা কিন্তু মনের সায় না থাকলে একতা হয় না। একত্রিত হলেও ঐক্য গড়ে ওঠে না।

<u>গণমানুষের মুখের ভাষা বাংলা</u>

বাংলা ভাষার আছে সম্মোহনি শক্তি। তাকে এগুতে হয়েছে নিজে নিজেই। আর এগুতে হয়েছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অতীতের ইতিহাসে বাংলা কখনই রাষ্ট্রভাষা ছিল না। রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত,ফার্সি,ইংরেজি। বাংলায় পাল বংশের রাজারা রজত্ব করেছেন। তারা বাঙালি হলেও তাদের রাজসভায় বাংলার কোনো স্থান ছিল না। সেখানে সংস্কৃত ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার পরে এসেছেন সেনরা। তারা ত বাঙালিই নন। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করেছেন। এর প্রমাণ ইতিহাসে আছে। কিন্তু এতো স্বাধীনকে নয় অধীনকে সাহায্য করা।

আধিপত্য চাপিয়ে দিয়ে বলা, যাও যত পার ঘুরে বেড়াও। পাঠান ও মুঘলদের আমলে রাজভাষা ছিলো ফার্সি ছিল ফার্সি। সম্ভ্রান্তরাও সেই ভাষাই ব্যবহার করতেন, বাংলা নয়। এর পর এলো

ইংরেজ,আরো দূরের এক ভাষা নিয়ে। ফার্সি চলে গেছে,তবে জায়গা দখল করে নিয়েছে ইংরেজি। এভাবেই বাংলা ভাষা বেঁচেছে ও বেড়েছে,রাজ দরবারের বাইরে অবজ্ঞায়,অবহেলায় ও বিরোধীতা সত্ত্বেও। এ হচ্ছে সাধারণ মানুষের ভাষা, ব্রাত্যজনের,অবহেলিত জনগণের। সংস্কৃতের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট সে,অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকে নিম্নবর্গের পাত্র-পাত্রীরা অপভ্রংশে কথা বলত গ্রামের লোকের মতো। শহরের লোকদের আমোদ দেবার জন্য। কিন্তু বাংলার দিক দিয়ে ব্যাপারটা কৌতুকের ছিল না,ছিল জীবন-মরণের। বাংলা আত্মসমর্পণ করেনি, জ্বলে উঠেছে আপন মহিমায়।

<u>উগ্রজাতীয়তাবাদের বিপক্ষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভাষা বাংলা</u>

ভারতবর্ষে ভাষা নিয়ে বিতর্ক অনেক দিনের পুরনো। বিশ শতকের শুরু থেকে আরো তীব্র হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলে। মহাত্মা গান্ধী ‘সর্বভারতীয় একভাষা ও একলিপি সম্মেলন’-এ সভাপতিত্ব করেছেন। ভারতজুড়ে হিন্দী ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। গান্ধী প্রকাশ্যে বলতেন, ‘অহিন্দিভাষীদের হিন্দি শেখা হচ্ছে ধর্ম’। ১৯৪৭ সালে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে ভারতে জাতীয়ভাষা নির্ধারণের ভোটাভুটিতে হিন্দীর পক্ষে ৭৮টি এবং হিন্দীর বিপক্ষে ৭৮টি ভোট পড়ে। সমাধানের লক্ষ্যে পুনরায় ভোটাভুটিতে হিন্দীর পক্ষে ৭৮টি এবং হিন্দীর বিপক্ষে ৭৭টি মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে হিন্দী ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ভারতের রাষ্ট্রপতির সচিব সি.এস ভেঙ্কটাচার লিখেছেন, ‘হিন্দী ভাষার প্রশ্নে চরমপন্থার অশুভ তাৎপর্য মুসলিম সম্প্রদায়কে যথার্থই আতঙ্কিত করেছিল। মুসলমানেরা উপলব্ধি করেছিল তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। এই বিশ্বাস দ্রুত মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপই পাকিস্তান সৃষ্টিতে একটি অন্যতম মুখ্য কারণ হয়েছিল’। ১৯৪৭ সালে ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত বলে গণ্য করা হয়। মাত্র ৮ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় ধর্মের দোহায় দিয়ে। ভাষাকে মুসলমানীকরণের নামে উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির হীন মানসিকতায়। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভক্তির পর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষোণা দেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেন,Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan.এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন,’আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য,তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।‘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের গণ পরিষদে বাংলাকে রাষ্টভাষা জন্য প্রথম দাবী উত্থাপন করেন। ফলে বলা যায়, ভারত এবং পাকিস্তানে উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দি ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে,বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক হিসেবে।

<u>সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প চর্চায় বাঁক ফেরা</u>

রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারি দমন নীতির চাপ সত্ত্বেও একুশের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার সাহিত্য সংকৃতি চর্চায় নয়া পলির সঞ্চার ঘটায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শেষ হতে না হতেই ২৭ এপ্রিল ঢাকায় নয়া রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন অনুষ্ঠান হয়। আগস্ট মাসে কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিন ব্যাপী সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। ভাষা থেকে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা,নাটক ও নৃত্য অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র-নজরুল-ইকবালের গান,কবিয়াল রমেশশীল ও ফণী-বড়ুয়ার কবিগান এবং লোক সংগীত ও আঞ্চলিক গানের রাতভর আসরে যে সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ তা ছিল মূলত প্রতিবাদি ও প্রগতিবাদী। সেই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক এবং জাতীয়তাবাদী। খ্যাতি লাভ করে একুশে সাহিত্য। প্রকাশ পায় স্মরণিকা ‘শহীদ স্মরণে’-এর শুরুতে মুদ্রিত হয়

রবীন্দ্রনাথের ‘উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই’

নজরুলের- ‘বন্দী থাকা হীন অপমান হাঁকবে যে তরুণ’ ইত্যাদি।

এতেই ছাপা হয় আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’।পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার মানুষকে সাচ্চা মুসলমান বানানো ও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রমুক্ত রাখার অপচেষ্টা স্মপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কবিতা,গান,গল্প,উপন্যাস,নাটক,শিল্পে একুশের চেতনায় উদ্ভাসিত হয় বাঙালি জাতিসত্তা। গড়ে ওঠে ছায়ানট,রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বাঙালির দার্শনিক,প্রাণপুরুষ।রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখ শুরু হয় বাঙালির হৃদয় স্পন্দনে।ধীরে ধীরে পহেলা পহেলা বৈশাখ জাতির প্রধান ঐক্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।চিরায়ত বাঙালির মিলনের সুর এই পহেলা বৈশাখ।

<u>ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার বিকাশ</u>

ভাষা আন্দোলন সবচেয়ে বড় যে প্রভাবটি পূর্ব বাংলার জনমানসে ফেলে,তা হলো, বাঙালি মনে পুনরায় আবার স্বাধীনতার চেতনাকে উস্কে দেয়,বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে ১৯৫২ সালের এই আন্দোলনের পরেই প্রবল স্বাদেশিকতা চিন্তা, স্বাধীনতা স্পৃহাকে আবার জাগিয়ে তোলে। বস্তুত; ১৯৫২ সালের এই ভাষা আন্দোলন স্বাজত্যবোধের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে স্ফুরিত করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন একটু একটু করে ধীর গতি হলেও আবার শুরু হয়। ১২৫৩ সালের শুরুতেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘শহীদ দিবস’হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি খুব ভোর থেকেই প্রভাত ফেরি করে ছাত্র জনতা দলে দলে যখন মিছিল করে আজিমপুর গোরস্থানে যাচ্ছিল তখন সকলের মুখই অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। বিকেলের জনসভায় ও মিছিলে প্রধান শ্লোগান ছিল-

শহীদ স্মৃতি অমর হোক, জালিম লীগশাহী ধ্বস হোক,

গণপরিষদ ভেঙে দাও, লীগশাহীর দালাল মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক’ ইত্যাদি।

ভাষা আন্দোলনোত্তর বাঙালির মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক চরম বৈষম্য,দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল।ভাষাকে সামনে রেখে ভাতের দাবীকে প্রধান করে দেখে। সামরিক,আধা-সামরিক,বেসামরিক চাকুরি।ব্যবসা,বাণিজ্য,শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।পাকিস্তানবাদীতা,হতাশা,বিমুখ,দ্বিমুখী,জাতিসত্তা সন্ধিহান জনগোষ্ঠী বাঙালি শ্লোগান দেয়-

তোমার আমার ঠিকানা,পদ্মা,মেঘনা,যমুনা,

আমি কে? তুমি কে?বাঙালি,বাঙালি।

বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির পথে একুশ

ভাষা আন্দোলনের পূর্বের (১৯৪৮-৫২) কালপর্বে পূর্ববাংলা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ৯৬ কোটি,৮৪ লক্ষ টাকা,অথচ পূর্ব বাংলার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৫কোটি ২১ লক্ষ টাকা। সেখানে ভাষা আন্দোলনের পরের বছরটিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। এটা নিশ্চয় এক গুণগত পরিবর্তন।আর তা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। পাকিস্তানি কেন্দ্রিয় সরকারের প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শনের মধ্যদিয়েই। পাকিস্তানি রাজনীতির স্বৈরচারী যাত্রায় নাটকীয় পরিবর্তনের পটভূমি ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন স্বৈরচারী শাসনের ভিত নড়বড়ে করে দিয়ে জনচেতনায় যে লীগ বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে,হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দির ত্রিমুখী নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের বিপুল নির্বাচনী বিজয় ও মুসলিম লীগের অভাবনীয় ভারাডুবি সেই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। ১৯৫৬ সালের প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একুশ পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই প্রথম ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের নির্যাতন ব্যতীত ভাষা আন্দোলন দিবস পালন করেন।গ্রেফতার হননি কেউ। নগ্ন পদযাত্রা,কালব্যাজ পরিধান প্রভাত ফেরির গান ঐক্যবদ্ধভাবেই শুরু হয়েছিল।শহীদ বরকতের মা-বোন কবরস্থানে আগমন করলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে একুশের প্রভাব

ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ বপিত ছিল। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি,পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নমনীয়তা বাঙালিকে উদ্‌বুদ্ধ করে দুর্বার আন্দোলনে। সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করেছে বাঙালি। ৬২ শিক্ষা আন্দোলন,৬৬ এর ৬ দফায় বাঙালির জাতিসত্তার চরম উৎকর্ষতা প্রকাশ পায়। ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান পাকিস্তানি শাসনে ফাটল ধরিয়ে দেয়। ৭০ এর নির্বাচন বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথ সুগম করে। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তি সংগ্রাম।দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা,গড়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তার আপন ঠিকানা।

মুক্তিযোদ্ধাত্তোর বাঙালি জাতিসত্তায় একুশ

দীর্ঘ সংগ্রাম,ক্ষয়ক্ষতি,রক্তক্ষরণের পর দেশ গঠনে জাতীয়তার দরকার ছিল খুব বেশি প্রয়োজন। দেশের সংহতি ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের জন্য বাঙালি জাতিসত্তা বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। বাংলাদেশ

ছাড়া বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও বাঙালি জাতিসত্তার নবজাগরণ ঘটে। স্বাধীনতার মহা নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাঙালি দেশ গঠনে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুষ্কৃতি কর্তৃক ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের শাহাদৎ বরণের পর বাঙালি নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। জাতিকে আবার পথ দেখিয়েছেন জাতীয় চার নেতা। ইতিহাসের নির্মম সত্য-বাঙালি জাতিসত্তা বার বার রক্তে রঞ্জিত হয়ে আসছিল। তবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে একুশের চেতনা। সামরিক শাসন,শোষণ,স্বৈরচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বাঙালি। আপন সত্তার তেজস্বিতায়।

ভবিষ্যত বাঙালি জাতিসত্তার পাহারাদার একুশ

একটি জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্জয়ের ঘনঘটা আসতে পারে,তবে পথ হারাবে না বাঙালি। নেতৃত্বের সংকট,দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে সুশাসন,গণতন্ত্র,বাঙালি সংস্কৃতিতে সামন্যতম আচড় লাগলে জেগে উঠবে সংগ্রামী বাঙালি। অনুপ্রেরণা যুগাবে একুশ। বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির ভাষা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। দেশের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুখের ভাষা যেমন শ্রদ্ধার পাত্র তেমনি পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষাকে মর্যাদায় আসীন দেখতে চায় বাঙালি। এমন কী পাকিস্তানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে চায় বাঙালি। বাঙালি জাতিসত্তার এ উদারতা শিখিয়েছে একুশ।

একুশের চর্চা এবং অঙ্গীকার

ক্ষুদিরাম বসু যে ধরা পড়েছিল সে তাঁর ভাষার কারণে। তরুণ প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের মুজাফফরপুরে গিয়েছিলেন। দুর্বৃত্ত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার উদ্দেশ্যে। ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন। সারারত ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে অভুক্ত ক্ষুদিরাম এক মুদি দোকানে গিয়ে মুড়ি চেয়েছিলেন। তাঁর উচ্চারণই তাকে ধরিয়ে দিলো তাঁকে। প্রফুল্ল চাকীকে রেলের একজন বাঙালি পরিচয় পেয়ে বাসায় নিয়ে গেলেন। আদর সমাদার করলেন বাঙালি জাতীয়তাবোধের দরদ থেকেই। পরের দিন ট্রেনে উঠিয়ে দিলেন চাকীকে। ট্রেনের ওই কামরায় ছিল আর এক বাঙালি। লোকটি ছিল পুলিশের চর। অতঃপর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ধরিয়ে দেয়। প্রফুল্ল চাকার ফাঁসি হয়নি, কেননা ঘটনাস্থলেই তিনি নিজের কাছে রাখা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ১৯৫২ সালে পুরান ঢাকায় উর্দু ভাষার দাবিতে মিছিল হয়। বাংলা ভাষার শত্রু-মিত্র চিনে রাখা অপরিহার্য। প্রতিক্রিয়াশীলদের রুখে দিয়ে বাংলা ভাষা পৌঁছিয়েছে অনন্য উচ্চতায়। বর্তমান তিন শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুখের ভাষার প্রতি আগ্রাসী হবো না। হবো শ্রদ্ধাশীল। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

একুশ বাঙালির প্রাণের অহংকার,হৃদয়ের স্পন্দন

একুশ একটি চেতনা,বাঙালির ক্ষয়মান জাতিসত্তার পুনরুদ্ধার। বাঙলা ও বাঙালি হাজার বছর শাসিত ও শোষিত হয়েছে বিদেশি ও বিভাষীদের দ্বারা। জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েছে দুখিনী বর্ণমালা,তবু মাঁথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাঙালির হৃদয়গভীরে। একুশ ও বাঙালির জাতিসত্তা একসূত্রে গাঁথা। একুশ বাঙালির চেতনা,একুশ বাঙালির অহংকার। অতুল প্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি- ‘মোদোর গরব মোদের আশা,আ-মরি বাংলা ভাষা’।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১. ভাষা- আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি আতিউর রহমান সম্পাদিত

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ড. মোহাম্মদ হান্নান

৩. ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক পটভূমি হুমায়ুন আজাদ

৪. ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল বদরুদ্দীন উমর

৫. বাঙলা বাঙালী ও বাঙালিত্ব আহমদ শরীফ

৬. প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

৭.ভাষা-আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য আবদুল মতিন
আহমদ রফিক

৮. বাঙালীর জাতীয়তাবাদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

৯. নতুন দিগন্ত সপ্তদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, প্রবন্ধ, কলকাতা ঘুরে এসে
মযহারুল ইসলাম বাবলা